সৃষ্টিতত্ত্ব বনাম বিবর্তনবাদ : পর্ব-২

চোখের জটিল গঠন নিয়ে আইডি (Intelligent Design) প্রবক্তাদের অসার যুক্তি এবং বিজ্ঞানীদের ডারউইনীয় ব্যাখ্যা

বন্যা আহমেদ

১ মার্চ, ২০০৫

পুর্ব্ববর্তী পর্বের পর ...

বিবর্তন যদি ধাপে ধাপে ক্রমপুঞ্জিত পরিবর্তন বা নির্বাচনের মাধ্যমে না ঘটতো, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে যদি একক পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হত তাহলে জীবজগতের পক্ষে আজকের অবস্থায় পৌছানো কোনভাবেই সম্ভব হত না। এখানে যে জিনিসটি আমাদেরকে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে তা হচ্ছে, মিউটেশন একটি আকস্মিক প্রক্রিয়া হলেও, প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনভাবেই আকস্মিক বা এলোপাথারিভাবে ঘটা একটি দৈবাৎ প্রক্রিয়া নয়। সৃষ্টিতত্ত্ব বা আইডি মতবাদ প্রচারকারীদের মধ্যে অনেকেই এই ভুলটি করে থাকেন। ...

[ভেবেছিলাম দৈনন্দিন জীবনে বিবর্তনের আরও কিছু উদাহরন দিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদের কাজটি চট করে শেষ করে ফেলবো। লেখাটির প্রথম অধ্যায়ে ডঃ টিম বেড়ার (Dr. Tim Berra: "Evolution and the Myth of creationism') বই থেকে প্রতিদিনকার জীবনে দেখতে পাওয়া বিবর্তনের কিছু উদাহরন অনুবাদ করতে শুরু করেছিলাম, সে ধারাবাহিকতায় এই লেখাটি লেখার কথা ছিল । কিন্তু শেষের উদাহরনটিতে এসে আটকে গেলাম - ডঃ বেড়া সেখানে মানুষের চোখের বিবর্তনের উদাহরনটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার সাথে বহুল আলোচিত 'সৃষ্টিতত্ত্বের যুক্তি' বা Argument from design প্রসংগটিও নিয়ে এসেছেন।

সমস্যা হল, ডঃ বেড়া বইটি লিখেছিলেন আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে, তখনও সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প বা Intelligent Design বা সংক্ষেপে আইডি(ID) নিয়ে এতোটা হইচই শুরু করেনি, তাই তিনিও আইডি প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করেননি এই বইটিতে। ৯০ দশক থেকেই মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি সহ বেশ কয়েকজন এই মতবাদটিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে চালাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এমনকি তারা দাবি করছেন আমেরিকার পাঠ্যপুস্তকে একে বিবর্তনবাদের বিকল্প বৈজ্ঞানিক যুক্তি হিসেবে যোগ করতে হবে। কয়েকদিন আগে অ্যাটল্যান্টায় ছাত্রছাত্রীদের বাবা মা রা স্কুল কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হয়েছেন, একটি কাউন্টির স্কুল বোর্ড ছাত্রদের জীববিজ্ঞান বইয়ের বিবর্তন অধ্যায়ের উপর একটি স্টিকার লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে বলা আছে বিবর্তন একটি মতবাদ হলেও তা কোন সত্যি ঘটনা নয় (http://www.cnn.com/2005/LAW/01/13/evolution.textbooks.ruling/)। ভাবলেও অবাক

লাগে একবিংশ শতাব্দীতে বসে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে কিভাবে বিজ্ঞানের পরিবর্তে ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। ইদানিংকালে আইডি নিয়ে এতোই কথাবার্তা হচ্ছে এবং আইডি- ওয়ালারা আমেরিকার বিভিন্ন রক্ষনশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থন পেয়ে এতই শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে, এই বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা না করলে আধুনিক বিবর্তনবাদের বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক অনুক্তই থেকে যাবে। তাই এই পর্বে ডঃ বেড়ার দেওয়া চোখের উদাহরনটি আনুবাদ করার সাথে সাথে কিছু বিখ্যাত বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিকের আইডিকে খন্ডন করে লেখা কিছু তথ্যও যোগ করছি।

তাহলে অতি পুরনো সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে আপাতদৃষ্টিতে দেখতে ঝকঝকে নতুন এই মতবাদের পার্থক্যটা কি? 'জীবের গঠন এত জটিল, নিখুত এবং সুক্ষ্ম যে এর পিছনে কোন সচেতন এবং বুদ্ধিমান স্রষ্টার হাত থাকতেই হবে'- সৃষ্টিতত্ত্বের সেই পুরানো যুক্তিটিকে আধুনিকতার মোড়কে পুরে নতুন নামে চালানোর প্রচেষ্টা ছাড়া আইডি আর কিছুই নয়। বিজ্ঞান এখন এতই এগিয়ে গেছে যে কোন নির্বোধের পক্ষেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পৃথিবী আসলে ৬০০০ বছর আগে সৃষ্টি হয়নি বা আমাদের চারপাশে বিবর্তনের ভুড়িভুড়ি উদাহরণ দেখা যায় না। তাই আইডি-ওয়ালারা সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আর এক নতুন উপায় খুজে বের করেছেন। তারা এখন বলছেন, আমাদের এই পৃথিবী আসলেই বাইবেলে বর্ণিত ছয় হাজার বছরের চেয়ে অনেক বেশী পুরনো এবং আমাদের চারপাশের জীবের মধ্যে ছোট ছোট বিবর্তনও ঘটছে ঠিকই, কিন্তু আদিতে সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে কোন এক বুদ্ধিমান সত্ত্বার (Intelligent agent) মাধ্যমে। যদিও সৃষ্টিকর্তা থাকার ব্যাপারটা চালাকি করে তারা তাদের মূল আর্গুমেন্টে আনেন না, তবুও 'পুরো সৃষ্টি নিখুঁত, সামঞ্জস্যপূর্ণ আর ডিজাইন্ড' - এ সমস্ত কথা ইনিয়ে বিনিয়ে প্রচার করে প্রকারন্তরে সেই 'মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের' দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন। তারা বলেন, আমাদের চারপাশের জৈব-রাসায়নিক সিস্টেমগুলো এতই সুক্ষ্ম এবং জটিল যে তারা বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে সৃষ্টি হতে পারে না, যে কোন একটি জটিল অংগের প্রত্যেকটি অংশ একে অন্যের উপর এতটাই নির্ভরশীল যে তারা পুর্নাংগ রূপ ধারণ না করা পর্যন্ত কোন কাজেই আসবে না। ৫%, ১০%, সিকিভাগ বা অর্ধেক চোখ নাকি জীবের কোন কাজে আসতে পারে না। ডঃ রিচার্ড ডকিনস, ডঃ কেনেথ মিলার সহ অনেক বিজ্ঞানী সাথে সাথেই তাদের এই দাবির অবৈজ্ঞানিক দিকগুলো তুলে ধরে একে ভুল প্রমাণিত করেছেন। এই লেখায় শুধুমাত্র চোখ এবং অন্যান্য জটিল ও তথাকথিত নিখুত অংগ প্রত্যংগগুলোক বিবর্তনবাদের দৃষ্টিতে কিভাবে দেখা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আইডির যুক্তি কেন সম্পুর্ভাবে অবৈজ্ঞানিক তা আলোচনা করা হয়েছে।

ডঃ বেড়ার বইয়ের বাকি উদাহরনগুলো পরবর্তী পর্বে লেখার ইচ্ছা রইলো।

ধন্যবাদ,
বন্যা, ৩/১/২০০৫]]

ধারাবাহিক অভিযোজন (Adaptation)ঃ হাজারো ছোট ছোট অভিযোজনের থেকে কি বড় কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে?

যারা জীববিজ্ঞানী নন তাদের পক্ষে বিবর্তনের সৃজনী ক্ষমতার তাৎপর্য বুঝে ওঠা খুবই কষ্টকর। সৃষ্টিতত্ত্ব

বা 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের' (argument from deign, এদেরকে Intelligent Design বা ID র প্রবক্তাও বলা হয়) প্রবক্তারা সবসময়ই অতি পুরানো একটি যুক্তি হাজির করেন - আপনি যদি একটা ঘড়ি কোথাও খুজে পান বা পরে থাকতে দেখেন তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে যে, ঘড়িটার কোন নির্মাতা বা সৃষ্টিকর্তা ছিল বা আছে। জীবের উদ্ভব এবং বিকাশের ক্ষেত্রেও এই যুক্তি দেখানোর প্রবনতা দেখা যায়। অথচ একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলেই বোঝা যায় যে, রাষায়নিক, জৈবিক বা ভৌত সব সিস্টেমের মধ্যে বিদ্যমান তথাকথিত এই 'বুদ্ধিদীপ্ত ডিজাইন' (design), এবং শৃংখলার (order) পিছনে কোন সৃষ্টিকর্তার হাত নেই। পানি যে রকম প্রাকৃতিক নিয়মে তার সমতল বা লেভেল খুজে নেয়, এগুলোও সেরকমই নৈর্ব্যক্তিক প্রাকৃতিক নিয়মের সক্রিয় বহিপ্রকাশ। একে ব্যখ্যা করার জন্য অতিপ্রাকৃতিক এক সৃষ্টিকর্তার সাহায্য নেওয়াটা অবৈজ্ঞানিক এবং অপ্রয়োজনীয় - সব সমস্যার সমাধান হিসেবে সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টিতত্ত্বকে হাজির করে আমরা আমাদের চিন্তার পরিসরকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি, সমস্যার গভীরে গিয়ে তার সমাধান খুজে বের করার জন্য যে বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুহলের প্রয়োজন তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলি, প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো নিয়ে আর মাথা ঘামাই না, আর তার ফলে উত্তরগুলোও থেকে যায় অজানা।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, বিবর্তন যদি নিতান্তই নির্বোধ এবং প্ল্যানহীন একটা প্রক্রিয়াই হবে তাহলে চোখের মত এত জটিল একটি অংগ তৈরী হল কিভাবে? অথবা, আমরা আমাদের চারপাশে হাজারো রকমের যে জীবগুলো দেখি তারা হাজারো রকমের বিচিত্র পরিবেশের সাথে এত চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে থাকলো কিভাবে?

আইডি বা Intelligent Design এর প্রবক্তরা চোখের গঠনগত জটিলতা নিয়ে অনেক হইচই করে থাকেন, তাদের মতে জীবের গঠন এত জটিল এবং নিখুত যে বুদ্ধিমান কোন স্রষ্টার ডিজাইন ছাড়া তা সৃষ্টি হতে পারে না। ডঃ রিচার্ড ডকিনস এবং কেনেথ মিলারসহ সব বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিকরাই তাদের বিভিন্ন বইতে এবং লেখায় এই যুক্তিটির অসারতা প্রমান করেছেন। একটু ভালো ভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, তাদের সবকটি যুক্তিই ভুল। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে অত্যন্ত জটিল অংগ-প্রত্যংগ গড়ে ওঠা যে সম্ভব তা ইতমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ আংশিকভাবে গঠিত চোখের উৎপত্তি বা বিকাশ জীবের টিকে থাকার সম্ভাবনাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলতে পারে তার অজস্র উদাহরন রয়েছে আমাদের চারপাশে এবং তৃতীয়তঃ মানুষের চোখকে যেভাবে তারা একটি নিখুঁত, অনন্য সৃষ্টি বলে দাবী করছেন তাও নিতান্তই একটি ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত উত্তর পেতে হলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (প্রথম অধ্যায়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং আরও কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে) সৃজনীক্ষমতার গুরুত্ব বুঝতে হবে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রত্যেক জেনারেশনে নতুন করে শুন্য থেকে শুরু করে না, মিউটেশনের মাধ্যমে ঘটা অনুকুল পরিবৃত্তিগুলোকে (variation) সে বংশপরম্পরায় জিইয়ে রাখে আর যে পরিবৃত্তিগুলো পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনা সেগুলোকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দেয়। এই মিউটেশন (পরিব্যপ্তি, বা Mutation) গুলো জীবের নিজস্ব প্রয়োজনে বা ইচ্ছায় ঘটে না, সুপরিকল্পিতভাবেও ঘটে না, হঠাৎ করেই ঘটে। একটা অনুকুল মিউটেশন ঘটার আগে বা পরে হয়তো হাজারটা মিউটেশন ঘটে যেগুলো টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। আর অনুকুল মিউটেশনগুলো একটার উপর আরেকটা কাজ করতে থাকে এবং তা থেকে ক্রমান্বয়ে আরও জটিল জীব অথবা অংগপ্রত্যংগ সৃষ্টি হয়। বিবর্তন ক্রমান্বয়ে (cumalative) ঘটতে

থাকা একটি প্রক্রিয়া, এটি কোন পুর্বনির্ধারিতভাবে সাজানো ডিজাইন প্রক্রিয়া নয়।

বিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্যতম মুল বিষয়ই হচ্ছে যে প্রাকৃতিক নির্বাচন হাজার হাজার বছর ধরে ধাপে ধাপে ঘটে। আজকে আমরা চোখের যে পূর্ণাংগ গঠন দেখে মুগ্ধ হই তা একদিনে সৃষ্টি হয়নি, এটা বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা ছোট ছোট পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। বিবর্তনের ইতিহাসে, খুব সম্ভবত, বেশ কয়েকবারই স্বতন্ত্রভাবে চোখের বিকাশ লাভ করেছে - মাকরসা, কাকড়া, বিভিন্ন পোকার মত arthropod বা সন্ধিবদ্ধ প্রানীদের মধ্যে, আবার অকটোপাস, শামুক, ঝিনুক জাতীয় মলাস্ক (Mollusk) প্রাণীদের মধ্যে এবং মেরুদন্ডী (Vertebrates)প্রাণীদের মধ্যে। এই তিনটি গ্রুপের মধ্যেই আলাদা আলাদাভাবে চোখের সৃষ্টি এবং বিকাশ ঘটেছে, এরা কাজও করে খুবই ভিন্নভাবে যদিও সবাই চোখের ভুমিকাই পালন করে। খুব সম্ভবত আলোর প্রতি সংবেদনশীল একধরনের স্নায়বিক কোষ থেকেই প্রথম চোখের বিকাশ শুরু হয়। কতগুলো সংবেদনশীল কোষকে কাপের মত অবতলে যদি ঠিকমতভাবে সাজানো যায় তাহলে যে নতুন একটি আদি-চোখের সৃষ্টি হবে তার পক্ষে আলোর দিক নির্নয় করা সম্ভব হয়ে উঠবে। এখন যদি এই কাপটির ধারগুলো কোনভাবে বন্ধ হয় তাহলে আধুনিক pin-hole camera র মত চোখের উৎপত্তি ঘটবে। তারপর একসময় গতি নির্ধারণ করতে পারে এমন একটি অক্ষিপট (Retina) বা রং বুঝতে পারে কোনের (cone) মত এমন একটি অংশ বিকাশ লাভ করে তাহলে আরও উন্নত একটি চোখের সৃষ্টি হবে। এরপর যদি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে Iris diaphramer উৎপত্তি ঘটে তাহলে চোখের ভিতরে কতখানি আলো ঢুকবে তা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হবে, তার ফলে প্রাণিটির প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় টিকে থাকার সম্ভাবনাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। ক্রমে ক্রমে যদি লেন্সের(lens) উদ্ভব ঘটলে তা তাকে আলোর সমন্বয় এবং ফোকাস করতে সহযোগীতা করবে আর এর ফলে চোখের উপযোগীতা আরও বাড়বে। এইভাবেই সময়ের সাথে সাথে মিউটেশনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়িক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আমরা আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পায়। কিছু আদিম প্রানীর মধ্যে এখনও আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিছু এক কোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে নামমাত্র ধারণা করতে পারে, আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলি একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরার মত মেরুদন্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে, যা দিয়ে বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

বিবর্তন যদি ধাপে ধাপে ক্রমপুঞ্জিত পরিবর্তন বা নির্বাচনের মাধ্যমে না ঘটতো, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে যদি একক পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হত তাহলে জীবজগতের পক্ষে আজকের অবস্থায় পৌছানো কোনভাবেই সম্ভব হত না। এখানে যে জিনিসটি আমাদেরকে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে তা হচ্ছে, মিউটেশন একটি আকস্মিক প্রক্রিয়া হলেও, প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনভাবেই আকস্মিক বা এলোপাথারিভাবে ঘটা একটি দৈবাৎ প্রক্রিয়া নয়। সৃষ্টিতত্ত্ব বা আইডি মতবাদ প্রচারকারীদের মধ্যে অনেকেই এই ভুলটি করে থাকেন। একটি জীবের কোন বৈশিষ্ট্যের উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে কাজ করবে তা নির্ভর করে জীবটির নিজস্ব পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতা বা তার বংশবৃদ্ধি করার যোগ্যতার উপর। এখানে আরেকটি গুরুত্বপুর্ন বিষয় হচ্ছে, বিবর্তন কখনোই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে না, প্রাকৃতিক নির্বাচন কোন চরম লক্ষ্যে বা নিখুত সৃষ্টিতে পৌছানোর প্রতিযোগিতা করে না, তার লক্ষ্য অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদি - সে প্রত্যেকটি ছোট বা বড় পরিবর্তনকে নির্বাচন করে জীবটির বংশবৃদ্ধি বা

টিকে থাকার ক্ষমতার ভিত্তিতে। দীর্ঘ সময়ের প্রবাহে, ক্রমাগতভাবে ঘটতে থাকা একেকটি নির্বাচনের কোন একটিকে সর্বশেষ বা চূড়ান্ত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যাবে না। জীবের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের উপর নির্বাচন প্রক্রিয়া কাজ করে স্বতন্ত্রভাবে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ছোট বা বড় যে কোন পরিবর্তন একটি জীবকে আরও উন্নত বৈশিষ্টে সজ্জিত করে তোলে এবং সে তার নির্দিষ্ট পরিবেশে টিকে থাকতে এবং বংশবৃদ্ধিতে আরও যোগ্য হয়ে ওঠে। হাজার হাজার বছরে একটি প্রজাতির কোটি কোটি জীবের মধ্যে ক্রমাগত বংশগতীয় (genetic) পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন অংগ প্রত্যঙ্গ আরও উন্নত এবং জটিল রূপ ধারণ করে এবং এক সময় চোখের মত পুর্নাঙ্গ একটি জটিল অঙ্গ সৃষ্টি হয়। চোখ শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়নি, নির্দিষ্ট কোন সময়ে বিদ্যমান বৈশিষ্ট গুলোর উপর লাখো বছর ধরে একটার পর একটা পরিবর্তনের ফলেই চোখের জন্ম হয়েছে। আর যেহেতু বিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকে তাই একে কোনভাবেই আকস্মিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বংশগতীয় পরিবৃত্তি (genetic variation) দৈবক্রমে ঘটতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে প্রকৃতির নিয়ম মেনে যা থেকেই নির্ধারিত হয় কোন কোন পরিবৃত্তি একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে টিকে থাকবে এবং কোনটি কালের ব্যাপ্তিতে হারিয়ে যাবে।

সৃষ্টিতত্ত্বের প্রবক্তারা একটি যুক্তি প্রায়ই হাজির করেন যে চোখের (কিংবা কান, পাখা, ফুসফুস ইত্যাদি) মত একটি গুরুত্বপুর্ন অংশ ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ মধ্যবর্তী পর্যায়গুলো ঠিকমত কাজ করতে পারবে না , এবং তার ফলে তাদের কোন উপযোগীতাই থাকতে পারে না। তারা আসলে এখানে বিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপুর্ন দিকটিই বুঝতে পারছেন না বা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। জীবের কোন অংশকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃষ্টিকোন (টিকে থাকবার ক্ষমতা বা আর বেশী করে বংশবৃদ্ধি করার যোগ্যতা) থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে আসার জন্য পুর্নাংগভাবে বিকাশ লাভ করার প্রয়োজন হয় না। অন্ধ হওয়ার থেকে আংশিক দৃষ্টিশক্তি থাকা অনেক ভালো। আমাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিক্ষীনতার (myopia), দুরের বা কাছের দৃষ্টিহীনতার সমস্যা আছে, তার ফলে আমরা দুরে বা কাছে অস্পষ্ট দেখি। কিন্তু আমরা যদি আদিম কালের মত বন্য জীবন জাপন করতাম এই সীমাবদ্ধতাসহ চোখই আমাদেরকে অনেকখানি সুবিধা এনে দিতে পারতো। আমরা খাওয়া, আশ্রয়, সঙ্গী, বা শিকারী পশুদের দেখতে পেতাম, তাদের নড়াচড়া বুঝতে পারতাম। যে জনসমষ্টির মধ্যে কোন দৃষ্টিশক্তিই নেই বা খুবই সীমিত দৃষ্টিশক্তি আছে তাদের জন্য চোখের বা চোখের মত যে কোন অঙ্গের বিন্দুমাত্র উন্নতিই অনেক বাড়তি সুবিধা এনে দেবে, এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন তাকেই বেছে নেবে। একেবারেই দর্শনশক্তি না থাকা মানে হচ্ছে সে পুরোপুরিই অন্ধ, এখন প্রানীটির মধ্যে যদি অর্ধেক বা সিকিভাগ দৃষ্টিক্ষমতাও বিকাশ লাভ করে তাহলেই সে কিছু হলেও তার শিকারীর গতিবিধি দেখতে পাবে বা বুঝতে পারবে। চোখের এইটুকু আংশিক বিকাশই প্রাণিটির বেচে থাকা বা না থাকার মধ্যে বিশাল একটি ভুমিকা রাখতে পারে। একই যুক্তি খাটে পাখার ক্ষেত্রেও, আমরা চারপাশে আংশিক পাখাসহ প্রচুর প্রানী দেখতে পাই। টিকটিকি, ব্যঙ্গ, শামুক জাতীয় গ্লাইড করে চলে এমন অনেক প্রানীর মধ্যেও আংশিক পাখার মত অংশ দেখতে পাওয়া যায়। গাছে থাকে এমন অনেক প্রানীর দুই জয়েন্টের মাঝখানে পাখার মত একধরনের চামড়ার অস্তিত্ব দেখা যায় যেটা আংশিকভাবে বিকশিত পাখা বৈ আর কিছু নয়। পাখাটি কত ছোট বা বড় তা এখানে ব্যাপার নয়, প্রাণীটি যদি কখনও গাছ থেকে পড়ে যায় তাহলে ওইটুকু পাখা ব্যবহার করেই সে তার জীবন বাচাতে পারবে যা কিনা তাকে টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা জোগাবে।

আইডি প্রবক্তাদের আরেকটি অতিপ্রিয় উদাহরণ হচ্ছে চোখের নিখুত গঠন যা কোন বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়া সৃষ্টিই হতে পারে না। আর অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন যেহেতু শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আরও উন্নততর রূপে পরিনত হয় তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই কোন প্রাণীর মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ

অংগপ্রত্যংগ রয়েই যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এখন দেখা যাক মানুষের চোখ আসলেই কতখানি ত্রুটিহীন বা নিখুঁত। চোখের অক্ষিপটের (Retina) ভিতরে একধরনের আলোক-গ্রহনকারী (Photoreceptor or photo cells) কোষ আছে যারা বাইরের আলোকে গ্রহন করে এবং তারপর একগুচ্ছ দর্শন স্নায়ুর (Optic nerve or ganglion cells) মাধ্যমে তাকে মস্তিষ্কে পৌছানোর ব্যবস্থা করে, যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই। কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা নিশ্চয়ই জালের মত করে ছড়িয়ে থাকা এই স্নায়ুগুলোকে আলোক গ্রহনকারী কোষগুলোর সামনে বসিয়ে দেবেন না! তাহলে তো বেশ কিছু আলো বাধা পাবে, আমরা এই বাধাটুকু না থাকলে যতখানি দেখতে পেতাম তার থেকে কম দেখতে পাবো এবং এর ফলে আমাদের দৃষ্টির মান অনেক কমে যাবে! আসলেই কিন্তু বাস্তবে আমাদের চোখ এভাবেই কাজ করে। আক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মত ছড়ানো থাকে, শুধু তাই না, এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তকনিকাগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও স্বাভাবিকভাবেই অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে, এর ফলে কিছুটা আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টশক্তির মান কিছুটা হলেও কমে যায়।

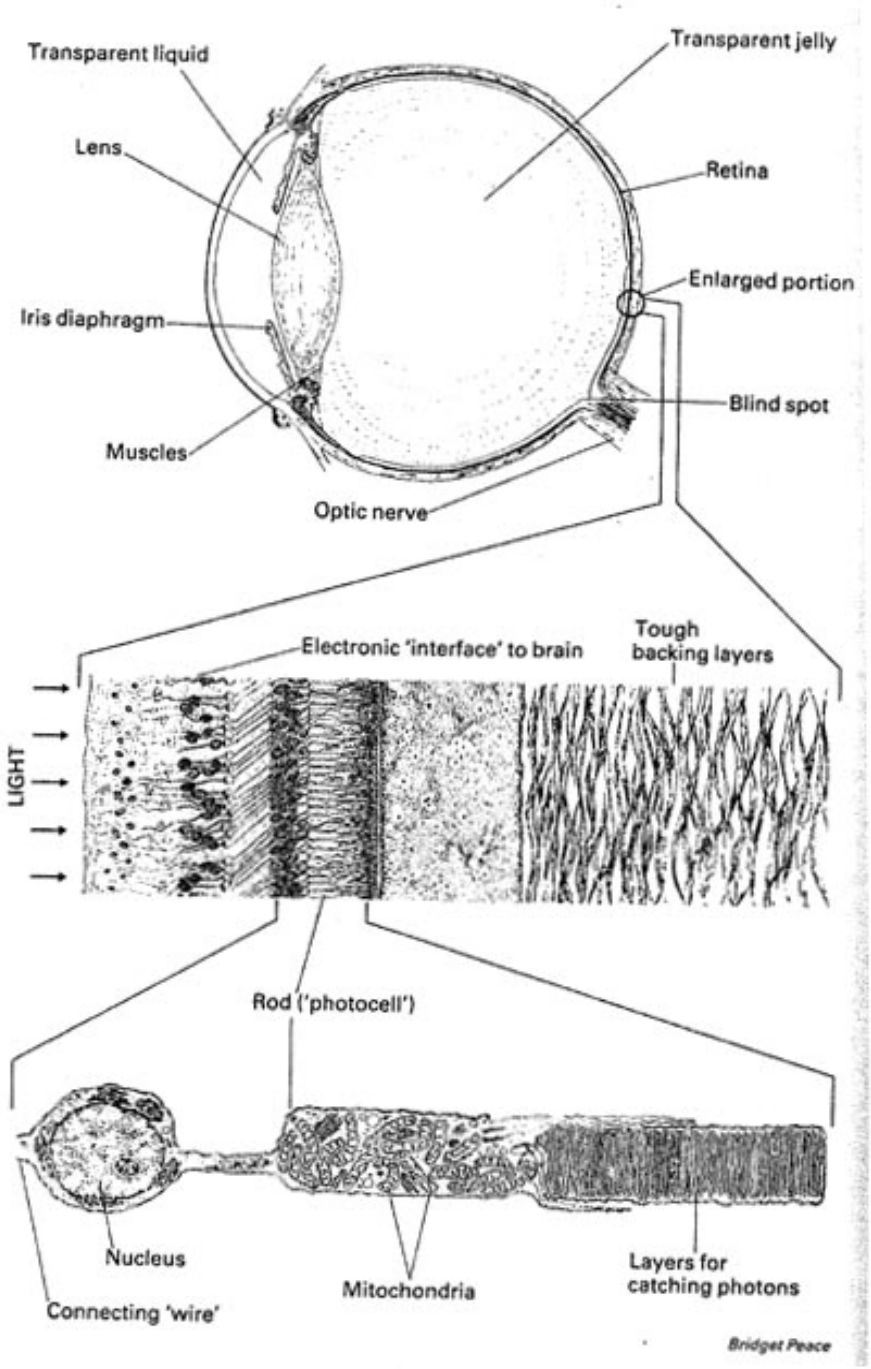

আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এই স্নায়ুগুলোর এরকম অসুবিধাজনক অবস্থানের কারনে। এই স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌছানোর জন্য অক্ষিপটকে ভেদ করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নেয়। এর ফলে একটি blind spot এর সৃষ্টি হয়, আমাদের প্রত্যেকের চোখেই এক মিলিমিটারের মত জায়গা জুড়ে এই blind spot টি রয়েছে, আমরা আপাতভাবে বুঝতে না পারলেও ওই জায়গাটিতে আমাদের দৃষ্টি সাদা হয়ে যায়। এই লেখাটি লেখার সময় ইন্টারনেট এ বিভিন্ন তথ্য খুজে বার করতে

গিয়ে নীচের ওয়েব সাইটটি খুজে পেয়েছিলাম। পাঠকেরা ইচ্ছা করলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের চোখের মধ্যের blind spot টি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

http://serendip.brynmawr.edu/bb/blindspot1.html

তাহলে কি চোখ সৃষ্টির সময় এই সীমাবদ্ধতাটুকুকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় খোলা ছিলো না? তাও তো ঠিক নয়! আমাদের সামনেই তো এরকম প্রানীরও উদাহরন রয়েছে যাদের স্নায়ুগুলো খুব নিখুতভাবে আলো-গ্রহনকারী কোষগুলোর পিছনে বসানো আছে! স্কুইড এবং অকটোপাসের আমাদের মতই একধরনের লেন্স-এবং-অক্ষিপট সম্বলিত চোখ আছে, যার প্রয়োজনীয় স্নায়ুগুলো অক্ষিপটের পিছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোন blind spot এরও সৃষ্টি হয়নি। আসলে বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের চোখের এই সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিকে কে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। বিবর্তন কাজ করে শুধুমাত্র ইতিমধ্যেই তৈরী বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে নতুন করে কিছু বদলে ফেলতে পারে না। মেরদন্ডী প্রানীর চোখের সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কের বাইরের স্তর বা অংশকে পরিবর্তন করে, বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের এই অংশটি পরিবর্তিত হতে হতে আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা লাভ করেছে। মস্তিষ্কের এই সংবেদনশীল কোষগুলো অক্ষিপটের আকার ধারন করলেও মূল গঠনটি অপরিবর্তিতই থেকে যায়, তার ফলে এই জালের মত ছড়িয়ে থাকা স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে যায়। কিন্তু মলাঙ্ক (স্কুইড বা অকটোপাস) জাতীয় প্রানীর চোখ বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে। মস্তিষ্কের মত ত্বকের স্নায়ুগুলো ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভিতরের স্তরে সাজানো থাকে। এ কারণেই মলাঙ্কের চোখের অক্ষিপটের সামনে স্নায়ুগুলো না থেকে পিছনেই রয়ে গেছে।

(এর পরের অধ্যায়ে বিবর্তনের উদাহরনগুলো শেষ করে, পর্‌বর্তী অধ্যায়ে জীবের বিবর্তন এবং মানুষের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।)

References:

Main translation was done from:
Evolution and the Myth of Creationism: A basic guide to the Facts in the Evolution Debate written by Dr. Tim Berra: Department of Zoology: Ohio Stet University

Supporting Information was taken from the following books and articles:

The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design written by Dr. Richard Dawkins: Charles Simonyi Chair of Public Undersatnding of Science at Oxford University.

Life's Grand Design written by Kenneth Miller published in Technology Review: MIT's Magazine of innovation on Feb 1994.

On Human Nature written by Edward O. Wilson: Professor of Zoology at Harvard University

The Improbability of God written by Dr.Richard Dawkins. Published in Free Inquiry Magazine, Volume 18, NO 3.